South India & Dooars Tour- 2025
দক্ষিন ভারত ও ডুয়ার্সে ভ্রমণ
ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার
Dr D B Majumdar

এবার দক্ষিণে

ঠিক এক বছর পর আবার কেরালা চললাম। এবারও একটা বিয়ে বাড়ীতে দিন তিনেক কাটিয়ে শুধুই ভ্রমণ। এবার আর কেরালায় ঘোরা হবে না। কালিকট থেকে সন্ধ্যার ট্রেন ধরে পরদিন সকালে সোজা কন্যাকুমারী। এবারের ভ্রমণ সেই অর্থে তামিলনাডুতে। আগেরবার কন্যাকুমারীর কাছে গিয়েও ফিরে এসেছিলাম। এবার শুরুই হবে কন্যাকুমারী দিয়ে। সেবারও কলকাতা থেকে প্লেনে চেন্নাই গিয়ে সেখান থেকে রাতের ট্রেনে কালিকট গেছলাম। এবারও তাই। আমার কাছে ভ্রমণ মানে ট্রেনে চাপা। প্লেনে সময় কম লাগে, কিন্তু একটা শহর থেকে আর একটিতে গিয়ে নামা। মাঝের কিছু দেখার সুযোগ নেই। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে না গেলে যেন বেড়ানোই হয় না।

আমাদের প্লেন কলকাতা থেকে বিকেল তিনটায়। এবার তিনটি ট্রলি ব্যাগ, তিনজনের। বেশ ভারীও হয়েছে। তাই চেক ইন লাগেজ করে যাব; এজন্য একটু সময় নিয়ে বেরোতে হল। আমার বর্তমান ঠিকানা থেকে দমদম বিমানবন্দরে যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। তবুও প্রায় তিন ঘন্টা আগে ক্যাব বুক করলাম। কলকাতার ক্যাবের কিছু ঘোড়া রোগ সারবে না। প্রথম জন নিজেই ২৮০ টাকা ভাড়া জানাল। সেটাই স্বীকার করে নিলাম। মোবাইল পকেটে ঢোকানোর আগে কি মনে করে আর একবার দেখতে গিয়ে দেখি, ক্যান্সেল করে দিয়েছে। আবার চেষ্টা করে দেখি, আর একজন ২৪০ টাকায় রাজী। আমাদের পাড়ার গলি খুঁজে আসতে সব ক্যাবেরই একটু সময় লাগে। এরও আসতে মিনিট পনের লাগল। দুপুর সাড়ে বারোটার পরও দমদম রোডে শম্বুক গতিতে চলল গাড়ী। তারপর সেই ভিআইপি রোডে ওঠার মুখে জট পাকানো। এবার আর যাই হোক, ডিজি যাত্রা এক বারেই আমাকে চিনতে পারল। অনেকদিন প্লেনে চড়ে এদিক ওদিক যাচ্ছি। এবারই সিকিউরিটি চেকের সময় আমার কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট নীল ব্যাগটাকে আটকাল। প্রথমে ভাবলাম, মোবাইলের চার্জার ব্যাগে রেখেছি, তাই আপত্তি। কিন্তু সি আই এস এফ জওয়ান বললেন, কয়েন গুলি বের করে ট্রেতে রাখুন। সে কি আর দুই একটা! গোটা তিনেক খোপ থেকে কুড়ি পঁচিশটি মুদ্রা বেরোল। না, তাতেও হল না। উনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ইঞ্চি চারেক লম্বা ধাতব পদার্থ আছে একটা। ঝট করে মনে পড়ল, দাঁত পরিষ্কার করার জন্য যে চিমটা ব্যবহার করতে হয়, সেটা আগের বার ইন্দোরের দিক থেকে ফিরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি; সেটাই কোথাও লুকিয়ে আছে। ব্যাগের ভেতর থেকে নাড়ি ভুঁড়ি টেনে বের করলাম। ঐ টুকু ব্যাগের ভেতর থেকে প্রায় একশ রকম জিনিস বেরোল। কিন্তু সেই ইঞ্চি চারেক ধাতব পদার্থ কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

ট্রেতে ছড়ানো শ খানেক জিনিস সহ ট্রে নিয়ে জওয়ান পিছন ফিরে, মূল স্ক্যানার এ দিয়ে এলেন। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। এবার তো পাশ করে বেরিয়ে এল। পাশ করে মন খারাপ, জীবনে এই প্রথম হল। হারানো চিমটা পাওয়ার একটা আশা মনে এসেছিল, সেটা হল না। কিন্তু পেলেও আমাকে দিত না বোধহয়। ওটার আশা ছেড়ে ঘড়ি বেল্ট পরতে শুরু করলাম। হঠাৎ সেই শ’ খানেক বস্তুর জঞ্জালের ভেতর থেকে, আমার স্ত্রী সেই হারানো চিমটা খুঁজে পেয়ে গেল। স্ক্যানার যে জিনিস খুঁজে বের করতে পারে নি, আমার স্ত্রী সেই জিনিস খুঁজে বের করে দিল। অর্থাৎ, মেশিন যতোই কেরামতি দেখাক, মানুষের কাছে সে এখনও ব্যাক ডেটেড! চেন্নাই সেন্ট্রাল রেল ষ্টেশনে ট্রেনে বসে গেলাম, ট্রেন ছাড়ার প্রায় এক ঘন্টা আগেই। সময় কাটানোর জন্যই কিছুটা লিখে সময় কাটাচ্ছি। ২৯.১.২০২৫.

Chennai Airport

কালিকটে

তিরিশে জানুয়ারি সকালে আমরা কোজিকোড় রেল ষ্টেশনে নেমেছি। গত বছরও প্রায় এই সময় আমরা এখানে এসেছিলাম। এখানে সকাল সাড়ে ছটায়ও কোন সোয়েটারের প্রশ্নই নেই। কলকাতার মার্চের শেষের মত আবহাওয়া। হোটেলে ঢুকে দেখি এ সি তো চলছেই, সাথে ফ্যানও। দুপুরে লু না বইলেও রাস্তায় বেরোতে হলে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরোতে হয়। আমরা এখানে এসেছি একটা বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এটা একটা আন্তরাজ্য বিয়ের অনুষ্ঠান। কেরালার কন্যার সাথে পোন্ডিচেরির পাত্রের বিয়ে। বর যাত্রীর দলের সাথে আমরা একটা টেম্পো ট্রাভেলার গাড়ীতে বিয়ের প্রথম অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চললাম। এই বিয়ের অনুষ্ঠান পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি এনগেজমেন্ট অর্থাৎ আমরা আগে যেটাকে আশীর্বাদ বলতাম। দুই পক্ষের প্রায় একশ নিমন্ত্রিত। আমার মত মেদিনীপুরের গন্ডগ্রাম থেকে উঠে আসা, তৎকালীন নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলের কি বিশাল পরিবর্তন হয়েছে, এক এক সময় নিজেই ভাবতে পারি না। এই বিয়ে বাড়ীর প্রথম দুটি অনুষ্ঠান একটি পাঁচ তারা হোটেলে। অবশ্য পাঁচ তারা হোটেলে যাতায়াত করছি বছর পনের হল। পেশার কারণে বিভিন্ন কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য ঐ সব হোটেলে যেতে হচ্ছে। তিরিশ তারিখ সকাল সন্ধ্যে দুটি অনুষ্ঠান একই হোটেলের দুটি হলে। আমার মত পেটরোগা লোকের কাছে যে কোন নিমন্ত্রন বাড়িই এক রকম শাস্তি। একত্রিশ তারিখ ভোর রাত তিনটে থেকে ছেলের বাড়ীর নিয়ম মত বিয়ে। মাঝ রাত থেকে উঠে, বিয়ে বাড়ীতে হৈ হৈ করার মত বয়স আর নেই। বর যাত্রীর দলের সাথে কন্যা পক্ষেরও জন দশেক আমাদের সাথে একই হোটেলে থাকছিল। আমাদের মেয়েও তাদের সাথে বিয়ে বাড়ীতে চলে গেল। পরে জেনেছি সেই বিয়ের অনুষ্ঠান মিটতে সকাল দশটা বেজে গেল প্রায়। আমরা যে জন পাঁচেক ভোরে উঠে যেতে পারিনি তারা সাড়ে দশটা নাগাদ বিয়ে বাড়ীতে গেলাম। এই বিয়ে বাড়ীর ব্যাপারটা , কেরালায় বেশ অন্য রকম। গত বছরও এরকম দুটি " কনভেনশন হলে" বিয়ে বাড়ীতে এসেছিলাম। এবার পৌঁছেই একটা ছবি তুলে আমার প্রায় ছয় শ' পরিচিতের কাছে পাঠিয়ে জানতে চাইলাম, এটা কিসের ছবি? প্রায় কেউই এটাকে বিয়ে বাড়ী বলে মনে করেননি। অনেকে পরে বলেছেন, থিয়েটার হলে বিয়ে হচ্ছে! এখানে বিয়ে বাড়ী মানেই এরকম।

বিয়ে বাড়ী

আগেও বিয়ে বাড়ীতে কেরালার ঐতিহ্যবাহী ঢোল সানাই বাজনা বাজতে দেখেছি। এই সানাইকে এরা সম্ভবত নাগেশ্বরম বলে। সানাইয়ের মত শব্দ হলেও প্রায় তিন ফুট লম্বা। এবার দেখলাম এই লম্বা বাঁশীর সাথে চকচকে পিতলের স্যাক্সোফোন বাঁশীও আছে। এই দুপুরের বিয়ের অনুষ্ঠান হল কন্যার বাড়ীর নিয়ম মত, মালয়ালি বিয়ে। এবার নতুন দেখলাম, হলের ভিতরে দুটি করে তুবড়ি একসাথে জ্বলল। দুপুরের বিয়ে বাড়ীতে দেখলাম,

বরযাত্রী দলের সাথে একটি মাস চার পাঁচ এর বাচ্চাও আছে। এই বাচ্চার মা বাবা আগের দিন আসতে পারেনি। শুনলাম, বাচ্চার কান্না থামাতে না পারায় ওদের প্লেন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। আজও দেখলাম, বাচ্চাটি গাড়ীতে উঠে থেকে নামা পর্যন্ত কেঁদেই চলল।

একত্রিশ তারিখ বিকেলে আমরা দুজন একটা অটো নিয়ে কালিকটের সমুদ্র সৈকত দেখে এলাম। আরব সাগরের এই সৈকত আমরা গত বছরও দেখেছি। এবার বিকেলে যাওয়ার সময় হওয়ায় আশা করেছিলাম, সূর্যাস্ত দেখতে পাব। কিন্তু সূর্য অনেক উপরে থাকতেই মেঘের আড়ালে চলে গেল। এখানে প্রায় এক কিমি সমূদ্রের পাড় বাঁধিয়ে সুন্দর রাস্তা, আর মাঝে মাঝেই ভালো বসায় বন্দোবস্ত আছে। এখানে সমুদ্রে সাঁতার কাটা নিষিদ্ধ। মাছ ধরার নৌকাও চোখে পড়ল না। কিন্তু বাঁধানো পারের পর প্রায় আধ মাইল রাস্তার পাশে পাশে জেলেদের আস্তানা আছে বোঝা যায়; অটোর থেকে ঝাঁঝালো মাছের গন্ধ পাওয়া যায়।

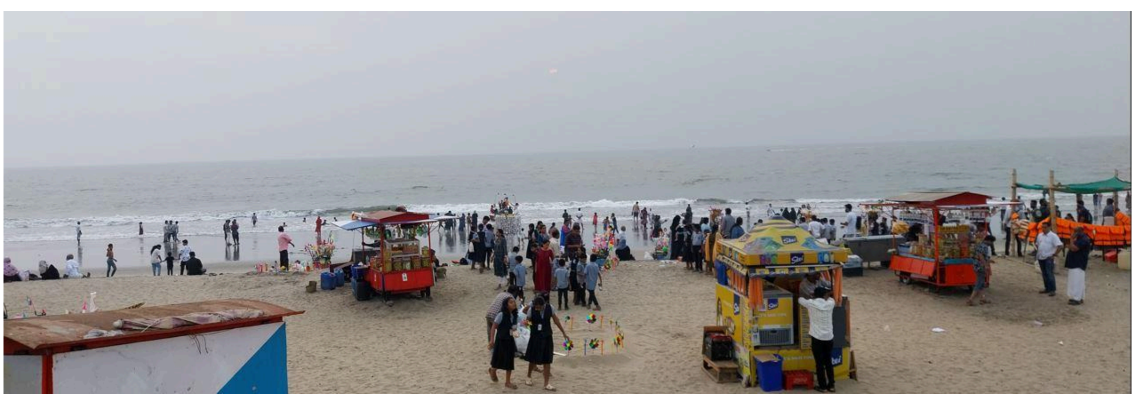

সাতটার আগেই হোটেলে ফিরে এলাম, টিভিতে টি ২০ ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য। সন্ধ্যাটা কেটে গেল, টিভিতে খেলা দেখেই। ফেব্রুয়ারির এক তারিখ সকালে আমি একাই হাঁটতে বেড়িয়ে পড়লাম। হোটেলের সামনের রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে চলেছি; এক জায়গায় এসে দেখি ডান দিকে যে রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তায় বেশ বাজার মত বসে গেছে। ডান দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে দেখি বিশাল ফলের বাজার। আমার ধারণা ছিল , কোলকাতার মেছুয়া বাজার বেশ বড় ফলের বাজার। কিন্তু এখানে ফলের বাজার দেখতে ঢুকে রাস্তা হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। বাজারের কিছু ছবি তুলে ফিরে চললাম। ফেরার সময় দেখলাম, বেশ কয়েক জায়গায় " থালী মন্দির"

যাওয়ার পথের দিশা দেওয়া বোর্ড। মাত্রই ছয় শ’ মিটার রাস্তা দেখে পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেলাম। প্রথমে দেখলাম একটা সুন্দর করে পাড় বাঁধিয়ে রাখা পুকুর। পুকুরের যে পারে একটা মন্দিরের গোপুরম দেখা যায় তার উল্টো দিকে গিয়ে দুই একটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। এবার দেখলাম লোকে পুকুর ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে গিয়ে দেখলাম, আসল মন্দির ওদিকেই। সামনেটা কিন্তু আমাদের দেখা কোন মন্দিরের মত নয়। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মত কোন গোপূরম নেই। সকালেই বেশ যাত্রী এসে গেছে। কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে, গোটা চারেক কাউন্টার। কোথাও মালয়ালম ছাড়া কিছু লেখা নেই। একটি কাউন্টারে মালয়ালামের সাথে ইংরেজিতে ধোতি কথাটা লেখা। দক্ষিণের সব মন্দিরের মত এখানেও পুরুষদের ধুতি পরে, উর্ধাঙ্গ খোলা রেখে মন্দিরে ঢোকার নিয়ম। আমার কোন আগ্রহ ছিল না, ঢোকার চেষ্টা করলাম না। পরে জেনেছি ওটা বেশ বিখ্যাত, ন শো বছরের পুরনো মন্দির। মন্দিরে এত কাছে আড়াই দিন থেকে গেলাম; মন্দিরে ঠাকুর দেখা হল না। বিকেলের ট্রেন ধরে আমাদের এবারের আসল ভ্রমণ শুরু হবে। স্টেশনে এক ঘন্টা আগে পৌঁছে গেলাম। বসে বসে সময় কাটানোর জন্য লিখতে শুরু করেছি। ট্রেনে উঠে মিনিট পনের লাগল এই দ্বিতীয় পর্ব শেষ করতে। চললাম কন্যাকুমারীর দিকে।

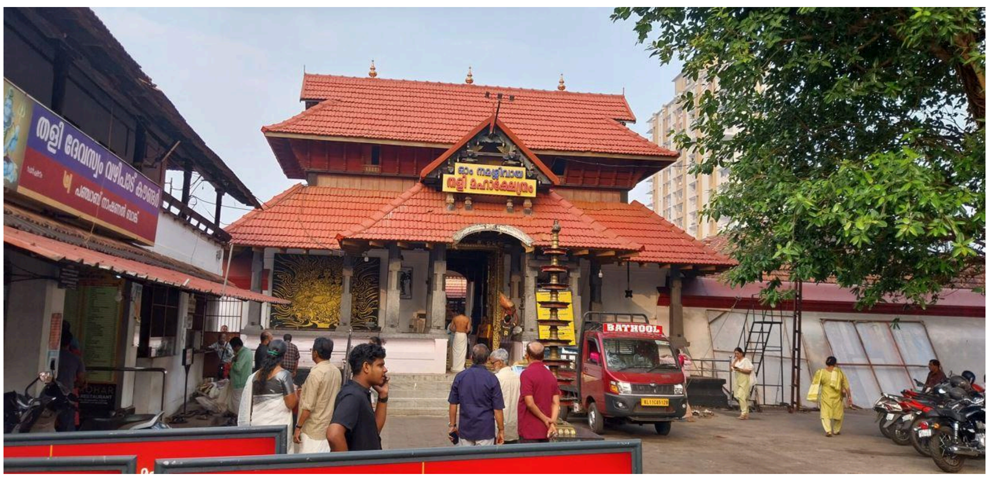

থালি মন্দির

.

কন্যাকুমারী

১ লা ফেবরুয়ারি সন্ধ্যায় আমরা কোঝিকোর থেকে ট্রেনে উঠেছি, কন্যাকুমারী যাওয়ার জন্য। এই ট্রেনটি আসচে অনেকটা দূর থেকে; গুজরাটের গান্ধী ধাম থেকে। দুপুর থেকেই দেখাচ্ছিল, ট্রেন আধ ঘন্টা মত লেটে চলছে। কোজিকোরে এল প্রায় এক ঘন্টা লেট করে। তাতে আমাদের অসুবিধা নেই; কেননা কন্যাকুমারীর তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের হোটেলে আমরা বারোটার আগে ঢুকতে পারব না। ওখানে সব হোটেলেই একই ব্যবস্থা। এই ট্রেন নাগেরকোয়েল জংশন স্টেশন পর্যন্ত যাবে। সেখান থেকে সতের কিমি রাস্তা অন্য গাড়ীতে যেতে আধ ঘন্টা মত লাগার কথা। ট্রেন নাগেরকোয়েল পৌঁছনোর নির্দিষ্ট সময় সকাল ছয়টা দশে। এদিকে এখন সূর্য ওঠে সকাল সাড়ে ছয়টার পর। তাই ট্রেন এক ঘন্টা দেরী করে পৌঁছলেও কোন অসুবিধা নেই। আমরা কিন্তু প্রায় ঠিক সময়ই পৌঁছে গেলাম। তখনও নাগেরকোয়েল ষ্টেশনে সূর্য ওঠেনি। একবার ভাবলাম পৌনে নয়টার ট্রেন ধরে কন্যাকুমারী যাবো; সেটাও নটা পঁচিশে পৌঁছে দেবে। আমি একাই ষ্টেশন থেকে বের হয়ে অটো আর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে খোঁজ নিতে গেলাম। দুই তিনটি বাস এসে, ডেকে ডেকে লোক তুলে নিচ্ছে দেখে, কন্যা কুমারী যাওয়ার বাস আছে কি না জানতে চাইলাম। জানলাম, বাস স্ট্যান্ডে গেলে কন্যাকুমারীর বাস পেতে পারি। সেই আবার অটো করে যাওয়া। এর মধ্যে অটো আর ট্যাক্সি ড্রাইভার সব বুঝে গেছে, এই লোকটা কন্যাকুমারী যাওয়ার জন্য গাড়ী খুঁজছে। জনে জনে এসে বলতে লাগল, আটো করে চল, চারশ টাকা লাগবে। এক ট্যাক্সি ড্রাইভার ছয়শো টাকা বলায় রাজী হয়ে গেলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম কন্যাকুমারী । হোটেলের রিসেপশন এ আমাদের তিনটি ট্রলি ব্যাগ রেখে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলের বারান্দা থেকে সামনে তাকালেই নীল

মহাসাগর। হোটেলের সামনে বাগানে মাঠে বেশ কয়েকটি ময়ূর ঘুরতে দেখে ছবি তুলে নিলাম। হোটেল থেকে সোজা পিচ ঢালা রাস্তা নেমে গেছে, সমুদ্রের পাড় ধরে চলে যাওয়া সুন্দর রাস্তায়। আমরা ঐ চওড়া রাস্তা ধরে বাম দিকে হেঁটে চললাম, কন্যাকুমারীর প্রধান আকর্ষণ বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল দেখতে। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলাম জমজমাট বাজার এলাকায়। যে কোন ভ্রমণ স্থানের মত রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য দোকানপাট। ট্যুরিষ্টরা দল বেঁধে ঘুরছে। আমরা একটা বেশ বড় রেস্টুরেন্টে ঢুকে একটু খেয়ে নিলাম। সবই দক্ষিণ ভারতের খাদ্য, ইডলী ধোসা বড়া ইত্যাদি। আমি দুটি বড় পুরী অর্থাৎ লুচি নিলাম। দাম অত্যধিক বেশী। একটু হেঁটেই দেখি লোকজন নৌকায় ওঠার জন্য লাইন দিয়েছে। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। দশ পনের ফুট এগিয়েই বুঝলাম, আমরা স্পেশাল টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছি। পাশের সাধারণ টিকিটের লাইন তখনও প্রায় সমান। টিকিটের দাম পঁচাত্তর টাকা। স্পেশাল এর দাম জন প্রতি তিনশ টাকা। একটা মোড় ঘোরার পর দেখলাম, আমাদের সামনে অন্তত পাঁচশ লোক। সাধারণ টিকিটের লাইনেও ঐ রকম ভিড়। টিকিট কেটে ভেসেলে ওঠা পর্যন্ত প্রায় দুই ঘন্টা মত লাগল। সাধারণ টিকিটের লাইন নিশ্চয়ই আরও বেশি সময় লাগবে।বোধহয় সময় বাঁচানোর জন্য কোন অনলাইন পেমেন্ট নেয় না। নয় শ টাকা ক্যাশ দিতে হল।এক একটি ভেসেল প্রায় তিনশ লোক নিয়ে ছাড়ল। নৌকায় বসে টের পেলাম সমূদ্রের ঢেউ কাকে বলে। মাত্রই মিনিট দশেক সময়ে পৌঁছে গেলাম বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালের ঘাটে। কিছুটা উপরে উঠে, বিনা খরচে জুতো রাখার জায়গা। জুতো ফেরৎ নেওয়ার সময় অবশ্য আস্তে করে বলল, চা খেতে কিছু দিন; কুড়ি টাকা দিলাম। জন প্রতি তিরিশ টাকার টিকিট কেটে উপরে উঠলাম। মন্দির চত্বরে ওঠার পর দেখি পুর্ব দিক থেকে ঝড়ের মত বাতাস বইছে। স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম; ছবি তোলা নিষেধ। ভেতরে তেমন ভিড় ছিল না। মন্দিরের পিছন দিকে বেরিয়ে তিন সাগরের মিলন দেখলাম। অনেক ছবি তোলা হল।

এরপর চললাম, গ্লাস বটম ব্রীজের উপর দিয়ে তামিল কবির মূর্তির দিকে। ব্রীজের অনেক নীচে, পাথরের উপর সমূদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, দেখলাম। আমার কাছে তেমন আহামরি কিছু মনে হলনা। এখনও আলাদা কোন টিকিট কাটতে হয় না। কবি থিরুভাল্লুভার এর প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু মূর্তি; দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় তিন তলা উঁচু বেদীর উপর। এই বেদীর ভেতর দিয়ে, ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় ঐ তিন তলায়। সমূদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলে নামার ইচ্ছা করে না।

ফেব্রুয়ারি মাসের সকাল দশটাতেই রোদে দাঁড়ানো কষ্টকর, মার্চের মাঝামাঝি থেকে কি অবস্থা হবে ভাবা যায় না। আমরা ঘন্টাখানেক থেকে ভেসেল ধরে ফেরার জন্য লাইন দিলাম। একটা ভেসেলেই সকলে ফিরতে পড়লাম। আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলের ঘরে ঢুকতে পারলাম। আমাদের যদিও চার বেডের ফ্যামিলি রুম নেওয়া ছিল, ঢোকার সময় বলল, ফ্যামিলি রুম সমূদ্রের দিকে হবে না, সি ফেসিং রুম নিতে হলে ছোট ঘর হবে। আমরা ছোট ঘরই লিনাম। ঘরের ভেতর বসেই সমূদ্র দেখা যায়।

এই সরকারী হোটেলের রেস্টুরেন্ট বেশ বড়। দুপুরের খাবার ভাতের সাথে সবই দক্ষিণ ভারতীয়, নারকেল দেওয়া তরকারী। আমরা একটা মাঝ ভাজা নিলাম। বলল সমূদ্রের মাছ; খেতে নাইলনটিকার মত। এখানে এখন সূর্য ডোবার সময় ছয়টা বত্রিশ। আমরা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে , সমূদ্র পারের রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিম দিকে হেঁটে চললাম। প্রচুর বাস, অটো, গাড়ী সব চলেছে একই দিকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার মিনিট পনের আগে পৌঁছে দেখি হাজার তিন চার লোক হাজির হয়েছে। সকলেই মোবাইল বাগিয়ে ধরে আছে, সূর্য ডোবার ছবি তোলার জন্য। সেই সব কাণ্ড দেখে তিনিও জলে না ডুবে মিনিট পাঁচেক আগে মেঘের আড়ালে চলে গেলেন।

সকালেও তাই হল। সূর্যাস্ত দেখার জন্য আরও বেশি লোক হাজির হলাম। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময় পেরকরে প্রায় দশ মিনিট পর মেঘের আড়াল থেকে বেরোলেন। কিছুটা বাম দিকে তাকালে একটা পাথর বাঁধানো রাস্তা মত , প্রায় আধ কিমি সমূদ্রের ভেতরে ঢুকে গেছে, দেখা যায়। কয়েকশ লোক সূর্যোদয় দেখতে ঐ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। ওরা ফিরছে দেখে আমরা ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। প্রথম একশ মিটার মত, পাথরের উপর বালি, ইত্যাদি ফেলে একটু রাস্তা মত করেছে। তারপর বিশাল বিশাল পাথর শুধু সাজানো। মাঝে মাঝে এমন ফাঁক আছে, পা ফেলার একটু গণ্ডগোল হলে হাড় ভাঙ্গার সমূহ সম্ভাবনা। আমরা চারশ মিটার মত এগিয়ে ফিরে এলাম।

হেঁটে হোটেলে ফেরার সময় সামনের মাঠে অনেক ময়ূর দেখলাম। বিকেলে কিন্তু এদের দেখা যায় না। হোটেলের ভাড়ার সাথেই সকালের খাওয়ার এর দাম দেওয়া আছে। আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নিলাম। শুধুই দক্ষিণ ভারতের খাদ্য। চা আর কফি ছাড়া সবেতেই নারকেল আর পারলে কারী পাতা দিয়ে দেয়। একটাই ভালো, এরা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দেয়না। আমাদের যে ড্রাইভার নাগেরকোয়েল থেকে কন্যাকুমারী পৌঁছে দিয়েছিল, তার সাথেই কথা বলে নিয়েছিলাম; সকাল দশটা নাগাদ বেরিয়ে তিন ঘন্টায় কয়েকটা জায়গা ঘুরিয়ে, একটা নাগাদ নাগেরকোয়েল ষ্টেশনে পৌঁছে দেবে। বারোশ টাকা দিতে হবে। নয়টার আগে ফোন করে জানাল, গাড়ী এখনই পৌঁছে গেছে। মন্দিরগুলি সাড়ে এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি বেরোনোই ভালো। আমরা নয়টার পরই বেরিয়ে পড়লাম। কন্যাকুমারী এলাকার মধ্যেই গোটা তিনেক বেশ ঝকঝকে মন্দির দেখে, নাগেরকোয়েল এর দিকে এগিয়ে গেলাম।প্রায় মাঝ রাস্তা এসে একটু সরু রাস্তা ধরে একটা বিরাট উঁচু গোপুরমের কাছে গাড়ী থামল।

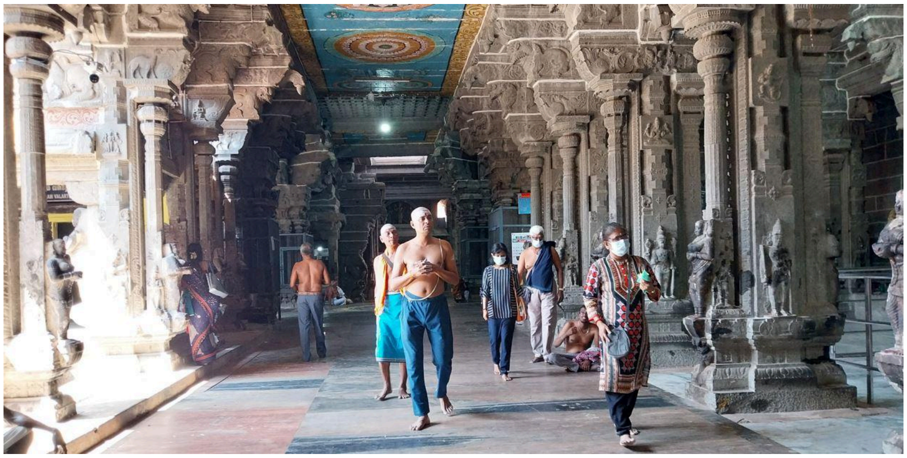
সুচিন্দ্রম মন্দির-এর ভিতরে

ড্রাইভার বলল, এটা সুচিন্দ্রম মন্দির, ভেতরে অনেক কিছু দেখার আছে। সব ঘুরে দেখে এসে, পার্কিং এর পাশে হোটেলে খেয়ে তারপর গাড়ীর কাছে এসো। আমরা এগারোটার মধ্যে মন্দির দেখে বেরিয়ে এলাম। ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ। ঢোকার সময় দেখলাম, ছেলেরা সব জামা খুলে হাতে নিয়ে চলেছে। এখানে ধুতি পরে,উর্ধাঙ্গ খোলা রেখে মন্দিরে ঢোকার কঠিন নিয়ম নেই। আমি প্যান্ট পরে, জামা আর গেঞ্জি হাতে নিয়ে ঘুরলাম। বেশ প্রাচীন মন্দির। অনেক খোপে খোপে দেবতার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। মূর্তি সবই সম্ভবত বিষ্ণু মূর্তি। আমরা এগারোটা কুড়ি নাগাদ নাগেরকোয়েল ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। তিন ঘন্টা পর আমাদের মাদুরাই যাওয়ায় বন্ধেভারত এক্সপ্রেস। এটাও প্রায় না জেনেই টিকিট কেটে নিয়েছি। স্টেশনে বসে লেখাটা শেষ করে নিতে চেয়েছিলাম। হল না। ট্রেন ঠিক দুটো কুড়িতে ছেড়ে দিয়েছে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মাদুরাই পৌঁছনোর কথা। দুই দিকের সবুজ নারকেল আর কলা বাগানের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলেছে। এদিকে অনেক তাল গাছের লাইনও দেখছি। কলকাতায় আজও সরস্বতী পূজা চলছে। এদিকে কিন্তু গতকাল বা আজ কোথাও দেখলাম না। ৩.২.২৫.

মাদুরাই

নাগেরকোয়েল থেকে বন্দেভারত এক্সপ্রেস ঠিক দুপুর দুটো কুড়িতে ছেড়ে দিল। এই বন্দেভারত গাড়িগুলির নাম প্রথম দিন থেকেই শুনছি; এই প্রথম চাপা হল। বেশ পরিস্কার বসার আসন আর অন্যান্য জায়গা। দুই পাশে ভালো ডিসপ্লে বোর্ডে ইংরেজি আর তামিল লেখা উঠছে, কোন ষ্টেশন আসচে, গাড়ীর গতি কত, পরের ষ্টেশন কতদূর ইত্যাদি। গাড়ী ছাড়তেই একজন কর্মচারী সব আসনে একটি করে জলের বোতল রেখে গেল; খালি আসনেও। একটা ষ্টেশন পরেই অবশ্য সব আসন ভরে গেল। এই গাড়ীতে এসি চলবে আমার খেয়াল ছিল না। হাফ হাতা জামা পরে উঠেছিলাম। একটু সময় পর থেকেই বেশ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল। এই জিনিসটা আমার কাছে দুর্বোধ্য। পয়সা দিয়েছি বলেই কি একটু বেশী ঠাণ্ডা নিয়ে নিতে হবে?! প্রায় সব লোকই তো দেখি ঠাণ্ডার জন্য গায়ে ওর্না বা কিছু জড়াচ্ছে। আমাদের ইভনিং স্ন্যাকস এর টাকা দেওয়া ছিল। একটা মশলা চায়ের প্যাকেট দিয়েছিল; গরম জলের কাপে চুমুক দিতে বেশ আরাম লাগছিল। মাদুরাইতে মিনিট পাঁচেক দেরী করে পৌঁছল ট্রেন। আমাদের হোটেল খুব একটা দূরে ছিল না। স্টেশন থেকে বেরোতেই একজন আটো চালক আমাকে ধরে নিল। খুব একটা দরাদরি করতে হল না। দেড়শ টাকা বলেছিল, আমি একশ কুড়ি টাকা বলতেই রাজী হয়ে গেল। মাদুরাই শহরের রাস্তা বেশ ঘিঞ্জি। রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য মোটর বাইক আর গাড়ী রেখে দিয়েছে। প্রচুর অটো। টোটো কিন্তু নেই। হোটেলে পৌঁছে ব্যাগ পত্র রেখে একটু পরেই বেরোলাম। আমাদের হোটেল মীনাক্ষী মন্দিরের পশ্চিম গেটের কাছে। গেটের সামনে গিয়ে দেখলাম সেরকম ভিড় নেই। কিন্তু মোবাইল জমা রাখার জায়গায় বেশ হুড়োহুড়ি। মোবাইল জমা রাখার জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। একজন মহিলা কটি মোবাইল? কে জমা দিতে এসেছে? তার মোবাইল নম্বর কি? এমনকি যে জমা করছে তার মুখের ছবি তুলে কম্পিউটার থেকে

রসিদ দিচ্ছে। ব্যাগ আর এক জায়গায় , স্ক্যান করে জমা দিতে হচ্ছে। ব্যাগের জন্য দু টাকা; মোবাইলের জন্য আর জুতোর জন্য কোন টাকা দিতে হয় না। বেড়ার মধ্যে দিয়ে একশ ফুট , মহিলা পুরুষ আলাদা লাইন। বাইরেই সব ভালোকরে সার্চ করে মন্দির চত্বরে ঢুকতে দিল। চত্বরের ভেতরে বেশ চওড়া রাস্তা আছে। লোকজন সেই রাস্তা থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসচে দেখলাম। আমরা আবার বেড়ার মধ্যে লাইন দিলাম। রাস্তার পাশের দেওয়ালে টিকিট দর্শন লিখে তির চিহ্ন দেওয়া দেখলেও টিকিট কেনার জায়গা দেখতে পেলাম না। প্রায় আড়াই তিনশ মিটার লাইনে এগিয়ে দক্ষিণ গেটের সোজা টিকিট কাটার জানালা দেখতে পেলাম। তখন ভাবলাম, মন্দিরের ভেতরে তো প্রায় ঢুকেই গেছি; টিকিট মাত্র একশ টাকা। তবুও বেড়ার মধ্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ছাদের তলায় পৌঁছেও প্রায় এক কিমি লাইন ঘুরে ঘুরে চলেছে। তাও ঠিক ছিল; কিন্তু সাড়ে সাতটা নাগাদ বোঝা গেল আর লাইন এগোচ্ছে না। সামনের একটি ছেলে ঈশারায় জানাল, আরতী শুরু হয়েছে। সবাই যে যার জায়গায় মাটিতে বসে পড়ল। আমারও পা ধরে গেছল; বসে গেলাম। এরকম শাস্তি হবে জানলে কি আর লাইন দিতাম! এখন আর বসে বসে ঝিমানো ছাড়া করারও কিছু নেই। আটটার পর লাইন নড়ে চড়ে উঠল। আরও আধ ঘন্টা পর মূর্তির সোজা লাইনে পৌঁছতে পড়লাম। পাশাপাশি দুটি লাইন। লোকজন ঝুঁকে পড়ে মূর্তি দেখার চেষ্টা করছে দেখলাম। সবথেকে কাছে যেখানে আমরা যেতে পড়লাম, সেখান থেকে মূর্তি প্রায় পনের কুড়ি ফুট দূরে একটি প্রায় অন্ধকার খুপরির মধ্যে। কয়েকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে; ভেতরে কোন ইলেকট্রিক আলো নেই। এদিকের সব মন্দিরেই এরকম ব্যবস্থা। কি মূর্তি কিছুই বুঝলাম না। বাইরে বেরোতে প্রায় রাত নয়টা বাজল। একটা ছোট্ট দোকানে রুটি খেয়ে হোটেলে ফিরলাম। পরদিন ভোরে উঠে মন্দিরের চার পাশের রাস্তায় হেঁটে এলাম। চার দিকে চারটি ঢোকার গেট বা গোপুরম। সবকটি গোপুরমেই মেরামতের কাজ চলছে। চারদিক দিয়ে বাঁশের খাঁচা আর সবুজ চট দিয়ে ঘেরা। এই মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম দেখতেই লোকে আসে। আমাদের যোগাযোগ এবার খারাপ হল; দেখা হল না।

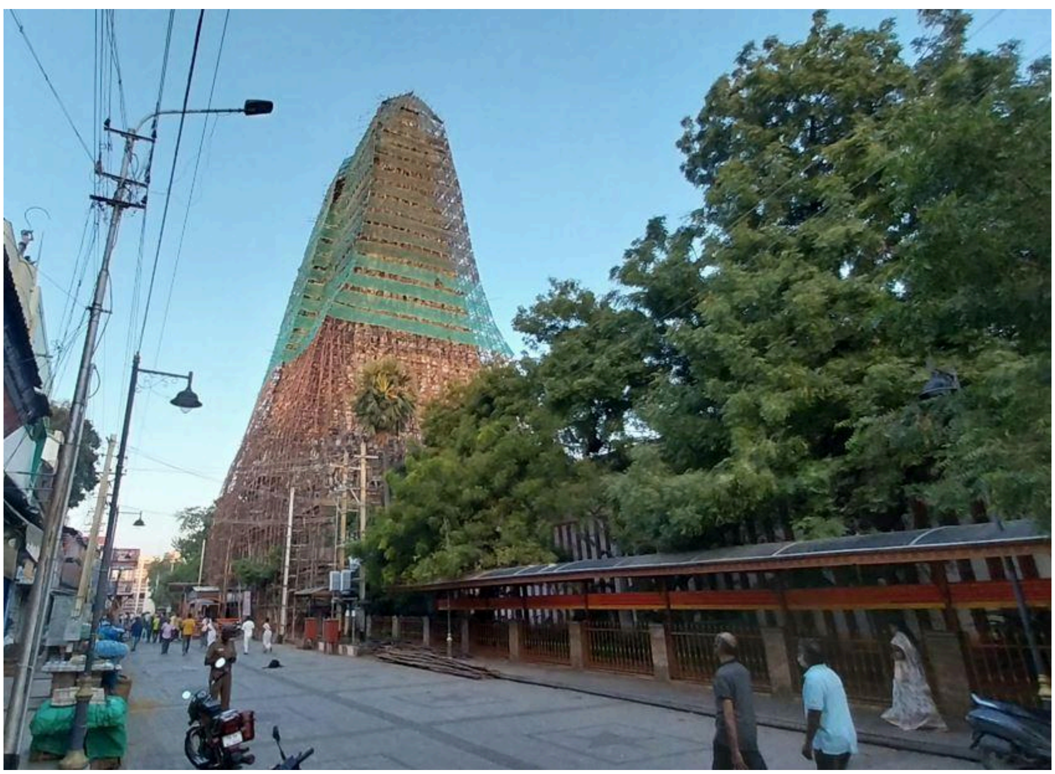

মন্দিরের ভেতরটা দেখে মনে হলো, বেশ পুরোনো মন্দির। কালচে পাথরের অসংখ্য থামের উপরে ছাদের মত। বাইরে থেকে মন্দিরের চূড়া বলে কিছু দেখা যায় না। সকালেই মন্দিরে ভিড় কম থাকে মনে হল। উত্তর গেটের

মোবাইল জমা করার জায়গা খালি দেখলাম। পশ্চিম দিকের গেটেই কয়েকজন যাত্রী দেখতে পেলাম। সকাল সাড়ে আটটার থেকে সাড়ে বারোটা, চার ঘন্টা আমরা মাদুরাই ঘুরে দেখার জন্য একটি গাড়ী অনলাইনে ঠিক করে রেখেছিলাম। আটটার আগেই ড্রাইভার ফোন করে জানাল, ঠিক সাড়ে আটটায় আসবে। আমরাও স্নান করে ব্যাগ পত্র গুছিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে দিলাম। আমাদের তিনটি ট্রলি ব্যাগ নিচে রিসেপশনে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এই অনলাইনে ট্যাক্সি বুকিং নিয়ে এবার বেশ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। চার ঘন্টার মাদুরাই ঘোরার জন্য , Red Taxi চেয়েছিল, ৯৪০ টাকা। কিন্তু চার ঘন্টার কম সময়ে ঘোরা শেষ হলেও, শেষে বিল মেটানোর সময় ১২০২ টাকা দিতে হল। এই একই চার ঘন্টার জন্য Make My Trip চেয়েছিল, ১৭০০ টাকা। ওদিকে মাদুরাই থেকে রামেশ্বরম যেতে Red Taxi চেয়েছিল সাড়ে চার হাজার টাকা। আমরা MMT থেকে গাড়ী পেলাম তিন হাজার পয়ষট্টি টাকায়। রেড ট্যাক্সি যে গাড়ী দিয়েছিল তার ড্রাইভার ছেলেটি বেশ ভদ্র। আমরা প্রথমে চললাম শহর থেকে পনের কিমি দূরে, একটা পাহাড়ের নিচে একটি বিষ্ণু মন্দির দেখতে। প্রথমেই স্পেশাল লাইন বলে দশ টাকার টিকিট কেটে দেখলাম, কোন লাইনই নেই, কোন মূর্তিও দেখার নেই। দশ ফুট এগিয়ে একটা বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়ানো এক পাণ্ডার কাছে গেলে, কপালে একটু ছাই লাগিয়ে দিল। ব্যাস। কিছুটা ঘুরে একটা বেশ ছড়ানো চত্বরে পৌঁছলাম। ওখানেই আসল বিষ্ণু মন্দির। আমাদের এদিককার মন্দিরের মত দেখতে নয়। সেই কালো কালো পাথরের উপর একতলার ছাদ। আমরা কিছুটা বেড়ার মধ্যে ঢুকে আবার বেরিয়ে এলাম।

আজাগার কোভিল মন্দির

এবার গাড়ি চলল সামান্য পাহাড়ী খাড়াই রাস্তা ধরে উপরের দিকে। এই রাস্তাটাই বেশ সুন্দর। সবুজ ঘন বন দুই পাশে। রাস্তায় আর মন্দিরের আশপাশে অসংখ্য বানর। লোকজন বানরদের কলা খেতে দিচ্ছে। পরে জানলাম, এই আলাগিরি বা ইয়েলাগিরি পাহাড়ের মুরুগণ মন্দির খুব বিখ্যাত। আমার তেমন কিছু দর্শনীয় মনে হল না। আরও একশ মিটার মত এগিয়ে আবার গাড়ী থেকে নামলাম। এখানে ভালো পাথর বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, পাহাড়ে কোন এক দেবতার মন্দিরে। পাথরের সিঁড়ির উপর শক্ত চটের কার্পেট বিছানো। সব জলে ভিজে আছে। এক রকম কটু গন্ধ গোটা রাস্তায়। নিচে উপরে অনেক লোক জল নেওয়ার জ্যারিকেন বিক্রী করছে। বুঝলাম উপরে কোন ঝর্ণা আছে। বেড়ার মধ্যে ঢুকে কিছুটা গিয়ে দেখি পাশের প্রশস্ত জায়গায় এসে সকলে ভেজা কাপড় পাল্টাচ্ছে। বুঝলাম ঐ ঝর্ণায় স্নান করতে লোকে লাইন দিয়েছে; আমরা ফিরে এলাম। আবার সেই পনের কিমি রাস্তা দিয়ে ফিরে এলাম শহরে। মাদুরাই এর অরবিন্দ চোখের হাস্পাতাল খুবই বিখ্যাত। ড্রাইভার ছেলেটিকে বলেছিলাম ওটা একবার দেখতে চাই; সে আমাকে হাসপাতালটির কাছে নিয়ে এল। রাস্তার

দুই পাশে ভালো মিলে বিরাট সব বিল্ডিং। একটা ছবি তুলে নিলাম। এরপর চললাম শহরের মধ্যেই একটি বিরাট জলাশয় দেখতে। এর মাঝে একটি মন্দির আছে; বছরের মধ্যে দুই তিন দিন যখন উৎসব হয় তখন ঐ মন্দিরে পূজা হয়। এই কম বয়সের ড্রাইভার ছেলেটি সেরকম কোন খবর দিতে পারল না। দুপুরে রামেশ্বরম যাওয়ার সময় ড্রাইভার বলল, মীনাক্ষী মন্দিরের চত্বর পাশের রাস্তা থেকে নীচু হয়ে গেছে, তাই বর্ষায় জল জমে যেতে পারে। ঐ জল পাইপে করে এই পাঁচ কিমি দূরের পুকুরে আনা হয়। এর জল খুব পবিত্র, এখানে কাউকে স্নান করতে দেওয়া হয় না। নাম বলল, টেপ্পাকুলাম লেক।

শহরে দেখার মত শেষ জায়গায় গেলাম, একটা প্যালেস। তিরুমালাই নাইসেকার প্যালেস। বিশাল বিশাল গোল গোল থাম। একটি বিরাট বড় সিংহাসন সাজিয়ে রাখা আছে। এত বড় চত্বর ঠিক দরবার হল বা নাট্যশালা বলে মনে হল না। বাইরে নীল রঙের বোর্ড আছে, তাতে লেখা , এটা নাকি কয়েকশ বছর আগে তৈরী।

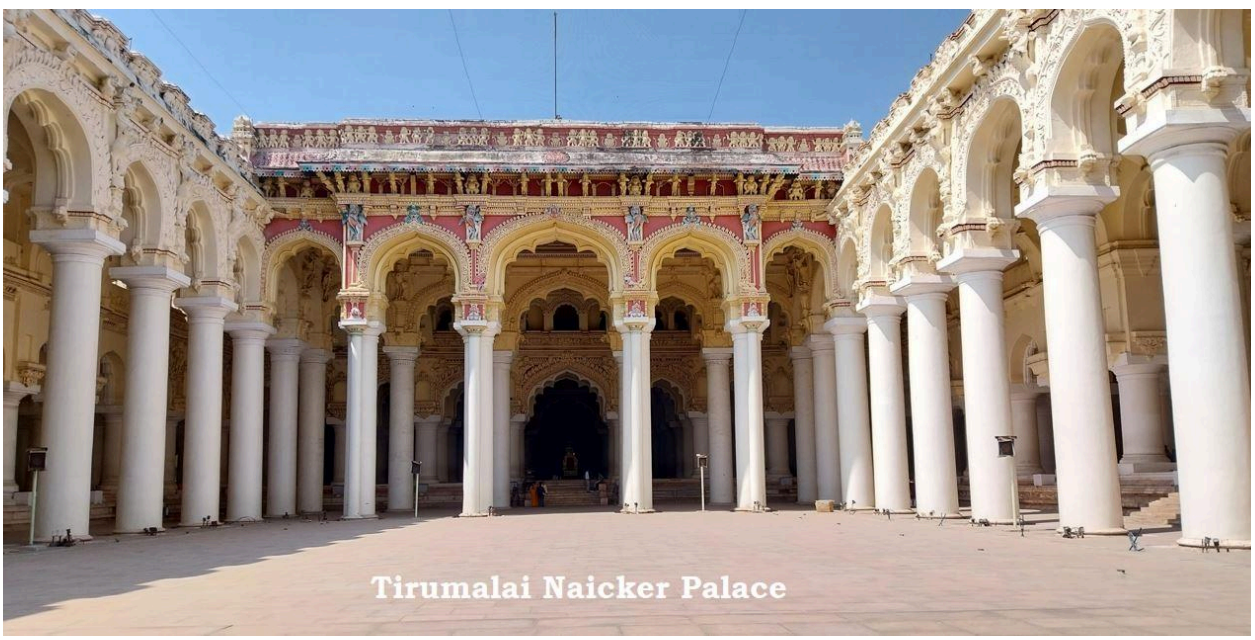

এখন মাত্র এক চতুর্থাংশ আছে। আমরা আমাদের হোটেলের পাশেই একটি সাধারণ হোটেলে খেয়ে এসে, পরের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। ঠিক একটার পর সেই গাড়ী এসে গেল। শহর দেখে মনে হল, গোটা শহরটাই বাণিজ্য শহর। অনেক রাস্তারই একপাশ ধরে হাজার হাজার মটরবাইক্ রাখা। এই রামেশ্বরম যাওয়ার গাড়ীর ড্রাইভার আমাদের মনে করিয়ে দিল যে, মাদুরাই এর বিখ্যাত সরবত, " জিগর ঠাণ্ডা!" ওটা আমরা খাইনি শুনে সে একটু অবাক হল। রাস্তায় দোকান পেলে আমরা খেতে পারি জানালাম। শহরের মধ্যেই একটি বড় দোকানের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। তিনজন নেমে খেতে গেলে গাড়ী পার্কিং এর সমস্যা হবে, পার্শেল নিয়ে নিতে বলল, আমাদের ড্রাইভার। দোকানে বেশ খদ্দের আছে দেখলাম। দাম লেখা , সাধারণ চল্লিশ টাকা, স্পেশাল আশি টাকা আর পার্সেল একশ টাকা। তিনটি প্লাষ্টিক বোতল বরফের ভেতর থেকে বের করে, ক্যারি ব্যাগে ভরে দিল। গাড়ীতে উঠে খেতে গিয়ে দেখি, থকথকে দুধের ক্ষীর, কড়া মিষ্টি। ঠাণ্ডা দাঁতে লাগছে। ঐ জিগর ঠাণ্ডা শেষ হওয়ার আগেই মাদুরাই শহর থেকে বেরিয়ে এলাম। ৬.২.২৫.
আজ বিকেলে চেন্নাই থেকে কলকাতা ফেরার ফ্লাইট। মেট্রো ধরে রওয়ানা দিলাম।

রামেশ্বরম
আমাদের এই মাদুরাই থেকে রামেশ্বরম যাওয়ার গাড়ীর ড্রাইভার লোকটি একটু অন্যরকম। আমরা গাড়ীতে উঠে বসার পর থেকেই নানান রকম গল্প জুড়ে দিল। ওর আগ্রহেই আমাদের জিগর ঠাণ্ডা খাওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুর অনেক গল্প কাহিনী শোনালো আমাদের। বিশেষ করে মাদুরাই এর গল্প। এই সাড়ে তিন ঘন্টার রাস্তা প্রায় পুরোটাই সে নানান গল্প করে কাটিয়ে দিল। ওর মামা বাড়ী মায়ানমার। কয়েকমাস পর গাড়ী চালিয়ে মামা বাড়ী যাবে, জানাল। এই মাদুরাই থেকে রামেশ্বরম রাস্তাটা বেশ ভালো। দুপুর বেলা বলেই রাস্তায় গাড়ী বেশ কম ছিল। যদিও ড্রাইভার বলেছিল ওদের ওখানে প্রচুর ধান চাষ হয়, আমি কিন্তু খুবই কম ধানের চাষ দেখলাম। হাই ওয়ের পাশে পাশে কিছু নারকেলের বাগান। আর মাইল এর পর মাইল বাবলার বন। মাঝে একবার নেমে আমি আর ড্রাইভার রাস্তার পাশের গুমটিতে চা খেলাম। এই গুমটিতে লাল কলা বিক্রী করছে। দাম বলল একটি কুড়ি টাকা। আমরা কেরালায় লাল কলা খেয়ে দেখেছি, এত দাম হওয়ার মত স্বাদ নয়। আমাদের এদিকের পাকা মর্তমান কলা ওর থেকে খেতে ভালো। বিকেল চারটা নাগাদ আমরা পামবান ব্রীজে পৌঁছলাম। এই ব্রীজটি মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সাথে রামেশ্বরমকে জুড়েছে। ওদিকে যাওয়ার সময় বাম দিকে বঙ্গোপসাগর আর ডানদিকে গালফ অফ মান্নার। বঙ্গোপসাগর এখানে উজ্জ্বল নীল। গাড়ী যাওয়ার সেতুর বাম দিকে রেল ব্রীজ। নতুন রেল ব্রীজ তৈরী হয়ে গেছে; এবার শুধু প্রধানমন্ত্রী সময় দিলেই উদ্বোধন হয়ে যাবে। সকলেই চাইবে ঐ ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে। আমাদের ড্রাইভার বলল, ব্রীজের উপর গাড়ী দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। ব্রীজ পেরিয়ে দাঁড়াল গাড়ী।

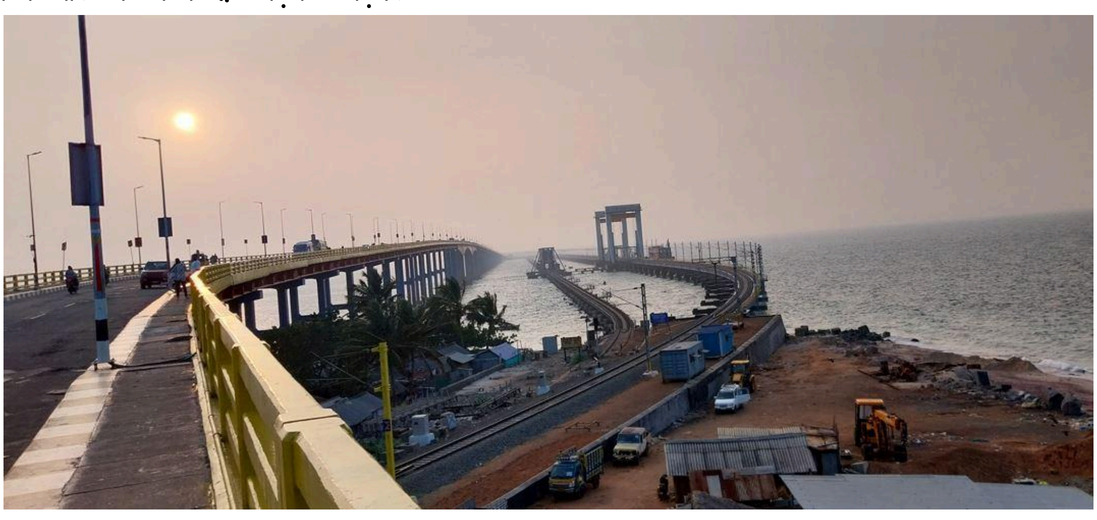

যদিও যাওয়া আসা দুই বারই দেখলাম, দু চারটি গাড়ী ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ব্রীজ পেরিয়ে আধ কিমি দূরে, বাঁদিকে, একটু নিচে একটি বাড়ী দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, ওটা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম সাহেবের নামে একটি মিউজিয়াম হয়েছে। পরদিন ফেরার সময় দেখা যাবে ভেবে আর নামা হয়নি। রামেশ্বরম ছোট্ট একটা শহর। একটু দূর থেকে মন্দিরের পশ্চিম গোপুরম দেখা যাচ্ছিল। আমাদের হোটেল এই পশ্চিম গেট ছড়িয়ে বাঁ দিকে প্রায় এক কিমি এগিয়ে। হোটেলে পৌঁছে রুমে ঢোকার আগেই, হোটেলের ম্যানেজার বলল, একটু বাঁ দিকে এগোলেই সমূদ্রের অগ্নীতীর্থম ঘাট পাবেন। ওখানে স্নান করে ভেজা কাপড়ে মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে আসুন। ঐ ভেজা কাপড়ে ব্যাপারটা শুনেই আমার স্ত্রী আর কন্যা জানিয়ে দিল, তারা পূজা দিচ্ছে না। আমরা সকালে যেতে চাই বলায় ম্যানেজার জানাল, সকালেই বেশী ভিড় হয়। আমরা বাইরে থেকে একবার মন্দিরটা দেখে আসার জন্য বেরোলাম। মিনিট চার পাঁচ হেঁটেই সমূদ্র সৈকত দেখতে পেলাম। এখানেও সমূদ্রের পাড় ধরে বাঁধানো রাস্তা আর কয়েকটা পাথরের বেঞ্চ আছে। অগ্নিতীর্থম ঘাটে দু চারজন যাত্রি স্নান করতে নেমেছে দেখলাম।

Agnitirtham

আমরা মন্দিরের পুর্ব গোপুরমের কাছে গিয়ে দেখলাম, কোন যাত্রী নেই। একটি মালার দোকানের লোক ডেকে বলল, মালা আর বেলপাতা নিয়ে ঢুকে যান, জুতো খুলে রেখে দিন, মোবাইল নিয়েই যেতে পারবেন। আমরা মালা বেলপাতা কিনে বেড়ার মধ্যে ঢুকে গেলাম। লাইন প্রায় নেই। একেবারে পান্ডাদের কাছে পৌঁছনোর আগে জন পনের লোকের লাইন। সব মিলে মিনিট পনের লাগল ঘুরে বেরিয়ে আসতে। ছোট্ট প্রায় অন্ধকার খুপরির মধ্যে ছোট্ট শিবলিঙ্গ। পনের কুড়ি ফুট দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যায়। মীনাক্ষী মন্দিরের মতোই মেটে রঙের পাথরের থামের উপরে ছাদ। হাতে মোবাইল থাকলে ছবি তো তোলাই হয়; একটু ভিডিও তোলাও হল। ভিডিওতে মন্দিরে পোষা হাতিটির একটু ছবিও এসে গেল। এই রামেশ্বরম মন্দিরে করিডোর নাকি পৃথিবী বিখ্যাত; একটু ভিডিও তুলেছি, পরে আপনাদের দেখানো যাবে।

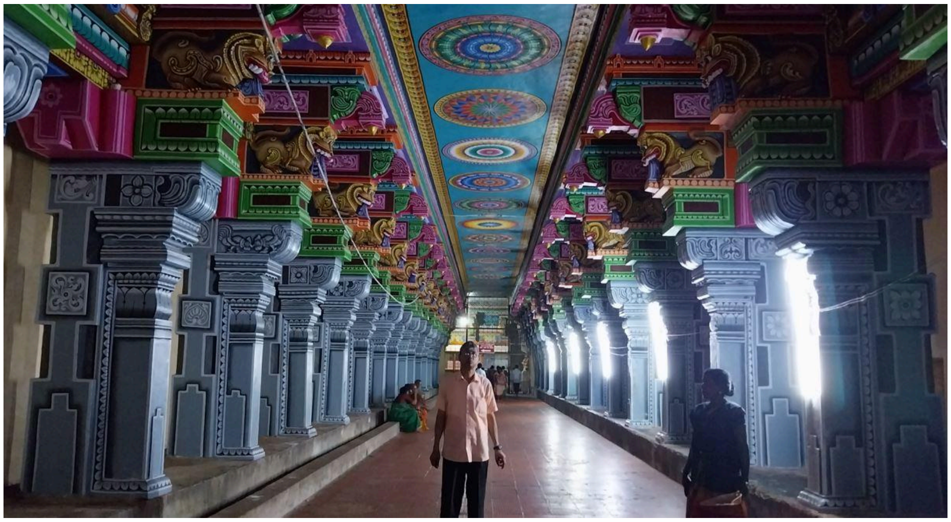

মন্দির থেকে বেরিয়ে আবার অগ্নীতির্থম ঘাটে এসে কিছু সময় বসে হোটেলে ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার পথে একটা ছোট রেস্টুরেন্ট থেকে রাতে খাওয়ার জন্য রুটী কিনে নিলাম। এখানে সমূদ্রের অবস্থান দেখে মনে হল, সকালে সমূদ্র থেকে সূর্য ওঠা দেখা যাবে। ভোরে উঠে সমূদ্রের দিকে হেঁটে এলাম। কন্যাকুমারী সৈকতের দশ ভাগের এক ভাগও লোক এখানে সূর্যোদয় দেখতে আসেনি। আকাশে মেঘ থাকায় এক ঘন্টা বেলা পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা গেল না। মন্দিরের দিকে একটু ঘুরে এলাম। সকালে দেখলাম, অগ্নীতীর্থম ঘাটে বেশ যাত্রীর ভিড়। ঘাটের উপরের চাতালে অন্তত পনের কুড়ি জায়গায় পান্ডা পুরুতরা যজ্ঞের আগুন জ্বেলে লোকজনকে নিয়ে বসে গেছে। সম্ভবত শ্রাদ্ধ শান্তির মন্ত্র পাঠ চলছে। ভেজা কাপড়ে মন্দিরে যাওয়া ব্যাপারটার কিছুটা চোখে পড়ল। অনেকে সমুদ্রে স্নান করে, ভেজা কাপড়ে, খালি পায়ে মন্দিরের উত্তর গোপুরমের দিকে চলেছে। উত্তর গেটের ভেতরে বাইশটি কুঁয়া আছে। কিছু লোক যাত্রী ধরতে গেটের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে; তাদের হাতে ছোট বালতি আর দড়ি। ওরা কুঁয়া থেকে জল তুলে যাত্রীদের মাথায় ঢেলে টাকা নেয়। বোর্ডে লেখা আছে, পঁচিশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে যেতে হবে। মাইকেও লাগাতার ঘোষণা চলছে, কাউকে অতিরিক্ত টাকা না দিতে। আমি গেটের ভেতরে কিছুটা ঢুকে, বেড়ার আগে পর্যন্ত দেখে এলাম। আমার স্ত্রী আর কন্যা উত্তর গেটের বাইরে থেকে হোটেলে ফিরে গেল। আমি মন্দিরের চার দিকের রাস্তা ধরে প্রায় দুই পাক ঘুরে দেখে এলাম। মন্দিরের চার দিকের রাস্তার পাশে পাশে অনেক হোটেল আছে। কিছু কিছু সংস্থার আশ্রম ও আছে। কিন্তু আমাদের পরিচিত কোন মিশনের বাড়ী দেখলাম না। সকালে রামেশ্বরম আর ধনুষ্কোডি ঘুরে দেখার জন্য গাড়ী বা অটো কিরকম টাকা নেয় খোঁজ খবর নিলাম। সব গাড়ী চার ঘন্টা ঘোরাতে দুই হাজার টাকা মত বলল; আর অটো বারোশ টাকা। বিকেলে মন্ডপমে ছেড়ে আসতে গাড়ী আর অটোর ভাড়া একই , পাঁচশ টাকা বলল সকলে। আমাদের হোটেল ছাড়তে হবে দুপুর বারোটার মধ্যে। ওদিকে মণ্ডপম থেকে ফেরার ট্রেন রাত ন টায়। তাই একেবারে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে , চার ঘন্টা ঘুরে , মন্ডপম চলে যাবো ঠিক করলাম। একেবারেই আমাদের হোটেলের গেটের বাইরে একজন বয়স্ক অটো চালক, গাড়ী মোছামুছি করছিল। তার সাথে কথা বলে, সবমিলে পনেরশ টাকায় রফা করলাম। দশটায় চেক আউট করে ঘর ছেড়ে দিয়ে, তিনটি ট্রলি ব্যাগ হোটেলের ম্যানেজার এর কাছে রেখে , বেরিয়ে পড়লাম। এই অটো চালক ভদ্রলোকের নাম চন্দ্রশেখর। আমি আজ পর্যন্ত বাইরে বেড়াতে গিয়ে যতো ড্রাইভার পেয়েছি, ইনি সবথেকে ভদ্রলোক। বেশী কথা বলেন না; কিন্তু কাজের কথাটি বলেন। কি কি দেখতে চান জানতে চাওয়ায় বললাম, আপনার জায়গায় বেড়াতে এসেছি, আপনি যা দেখাবেন তাই দেখবো। উনি বললেন, এক এক জায়গায় থেমে দুটি তিনটি দেখার জিনিস আছে, আলাদা করে গুণলে পণের বা সতেরটি পয়েন্ট হয়; ওরকম গোনার কোন মানে হয় না। সত্যিই তাই দেখলাম। ওনার ফোন নম্বর ৮৮৭০৭৯৮৫৪০. আপনারা কেউ রামেশ্বরম গেলে ওনার আটো নিতে পারেন। বড় অটো; সেরকম হলে ছয় জনের বসার জায়গা আছে। পিছনে তিনটি ট্রলি ব্যাগ রাখার জায়গা আছে। সি এন জি অটো, বড় ডিগডিগে অটোর মত শব্দে কান ঝালাপালা হয় না। শহর থেকে

বেরিয়ে বাঁ দিকে একটা রাস্তা ধরে সোজা চলল, ধনুষ্কোডির দিকে। রাস্তা খুব সুন্দর। দুই পাশে পুরোটাই প্রায় বাবলা বন। শেষের দিকে মাইল তিন চার রাস্তার দুই পাশে সমুদ্র দেখা যায়। শেষ মাইল দুই রাস্তার পাশে পাশে জেলেদের ঝুপড়ি। শেষ এক কিমি মত জায়গায়, রাস্তার পাশে কয়েকটা মাছ ভাজার দোকান। শেষ পর্যন্ত যাওয়ার আধ কিমি আগে আটো থামিয়ে ড্রাইভার আমাদের নেমে দেখে নিতে বললেন। রাস্তা থেকে পঁচিশ মিটার মত দূরে পুরনো রেল ষ্টেশনের ধ্বংসাবশেষ কিছু এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এখানে রেল গাড়ী চলত, ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে। ওখানেই একটি চালার মধ্যে একটি অতি সাধারণ সিমেন্টের বেদীর উপর, পাথরের তৈরি দুটি বড় বড় কালো রঙের পায়ের মডেল রাখা আছে। ওরা বলে, রামের পায়ের ছাপ। তা যে নয়, একটা শিশুও বুঝবে। ওখানে একটি বড় বোর্ডে ১৯৬৪ সালের ভয়ংকর ঘুর্ণি ঝড়ের খবরের কিছু ছবি দেওয়া আছে। ওখানেই দেখলাম যে ওখানে সে সময় একটা মেডিক্যাল কলেজ ও ছিল। বেশ চিত্তাকর্ষক খবর। রাস্তার উল্টো দিকে একটি চার্চের কিছুটা ধ্বংসাবশেষ রাখা আছে। রামেশ্বরম থেকে ধনুস্কোডি যাওয়ার মাঝ পথে, বাম দিকে একটি সরু রাস্তা প্রায় এক কিমি জলার মধ্যে ঢুকে গেছে। ওখানে একটি অতি সাধারণ মন্দির আছে। আমাদের আটো অন্য আরও প্রায় শ খানেক গাড়ির ভিড়ে ঢুকে গেল। আমরাও নেমে মন্দির দেখে এলাম। কথিত আছে যে ঐ জায়গায় বিভীষণ এর প্রথম রাজ্য অভিষেক হয়েছিল। ধনুস্কোডিতে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত গাড়ী নিয়ে যাওয়া গেল না। ঐ টুকু জায়গায় শ দুই গাড়ী আর শ দুই আটো মিলে জট পাকিয়ে ফেলেছে। আমরা হেঁটে শেষ পর্যন্ত গিয়ে , সমূদ্রের কিছু ছবি তুলে নিলাম। এক জায়গায় ছাতার নিচে দুটি দূরবীন লাগিয়ে, সমূদ্রের অন্য পারে শ্রীলঙ্কা দেখানোর ব্যবস্থা আছে। আমাদের কোন আগ্রহ ছিল না। ফেরার সময় এক কিমি ফিরে এসে, লাইট হাউস এর মাথায় উঠলাম। মাথা পিছু পাঁচ টাকার টিকিট কেটে, পাঁচ মিনিট উপরে থাকা যায়। লিফটে করে ওঠায় নামায়। উপর থেকে নিচের সোজা রাস্তাটা বেশ ভালো লাগে। রামেশ্বরমে ফিরে এসে , আরও দেড় ঘন্টা ঘুরে গোটা পাঁচ ছয় জিনিস দেখেছি। সে সবের কথা আর একটি পর্বে লেখা যাবে।

আমাদের আটো ড্রাইভার চন্দ্রশেখর আমাদের নিয়ে রামেশ্বরম শহরে ফিরে এলেন। রামেশ্বরমে ঢুকে বড় রাস্তা পর্যন্ত না গিয়ে, বাঁ দিকে একটা সরু গলির মধ্যে আটো ঢুকল। গলির মধ্যে একটি ছোট্ট তিন তলা বাড়ির সামনে আমরা নামলাম। জুতো খুলে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একটি সংগ্রহশালা পেলাম। গোটা তিনেক ঘরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম সাহেবের বিভিন্ন জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানে ওনার লেখা বই, বিভিন্ন রকমের স্মৃতি চিহ্ন বা মেমেন্টো বিক্রির ব্যবস্থা আছে। আমি ওনার দুটি ছবির নিচে, ওনার মূল্যবান বাণী লেখা মেমেন্টো কিনলাম। তিন তলায় শুধুই দোকান। যে কোন ভ্রমণ স্থানে যেমন হরেক মাল বিক্রী হয়, সেরকম। খেলনা বন্দুক থেকে দামী সুগন্ধি, মহিলাদের ভ্যানিটি ব্যাগ সবই পাওয়া যায়। ওখান থেকে গলির অন্য দিক

দিয়ে আমাদের আটো গিয়ে পৌঁছল বড় রাস্তায়। কয়েক মিনিটেই পৌঁছলাম, পঞ্চ মুখি হনুমান মন্দিরে। অতি সাধারণ চালার মধ্যে বেশ উচু, কালো পাথরের, পাঁচ মাথা হনুমান মূর্তি। পাশেই বড় জলের চৌবাচ্চায় ভাসানো পাথর। ফাঁপা পাথর ভাসছে,; ঐ পাথর দিয়েই নাকি সমুদ্রে সেতু করে , বানর সেনা , লঙ্কায় পৌঁছেছিল। লোকজন কিছু টাকা দক্ষিণাও দিচ্ছে। আমার কিন্তু দক্ষিণা দেওয়ার ইচ্ছা হল না। ওখান থেকে বড় রাস্তা ধরে শ দুই তিন মিটার প্যামবান ব্রীজের দিকে এগিয়ে আবার আটো থেকে নামলাম , এখানে ডান দিকে একটি খুব ঝকঝকে মন্দির। কোন দেবতার মন্দির বোঝগেল না। আমরা জুতো খোলার ঝামেলার জন্য বাইরে থেকেই দেখলাম। ওর পাশেই একটি পাঁচিল ঘেরা জায়গা দেখিয়ে বলল, সীতা কুন্ড। জল দেখা যায় না। রাস্তার উল্টো দিকে একটু এগিয়ে লক্ষ্মণ কুণ্ড। একটা পাড় বাঁধিয়ে রাখা পুকুর, মাঝে একটা থামের উপরে একতলা নাট্যমঞ্চ মত। ওর পাশেই একটা অতি সাধারণ মন্দির; সেটাও একটা ভিউ পয়েন্ট। আর একটু পাড়ার ভেতরের ঐ রকম বড় একটি পুকুর হল রাম কুণ্ড। জল বেশ নোংরা। ওখানেই একটা ছোট্ট রামের মন্দির। মন্দিরের পাশে একটি বেল তলায় শ খানেক কালো পাথরের সাপের মডেল সাজিয়ে রাখা। কেউ কেউ গুলিকে পরিক্রমা করছে। আমরা আমাদের হোটেলের কাছের একটা ছোট রেস্টুরেন্ট এর সামনে আটো থেকে নামলাম। আটো ড্রাইভার চন্দ্রশেখর আমাদের নামিয়ে চলে গেলেন। আবার বিকেল পাঁচটায় আসবেন। আমরা মাছ ভাত খেয়ে অগ্নি তীর্থম ঘাটের দিকে চলে গেলাম। দুপুরে ঘন্টা তিনেক সময় কাটাতে হবে। দুপুরে বাঁধানো ঘাট প্রায় ফাঁকা; কোন পান্ডা পুরুত নেই। কিছু কিছু লোক সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছে। মাঝে একদল বিদেশিনী একজন স্থানীয় গাইড এর সাথে এসে স্নান করে গেল। আমি বাঁধানো ঘাটের সিমেন্টের বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলাম। একটু দূরের জেটি থেকে বড় নৌকা কুড়ি পঁচিশ জন যাত্রী নিয়ে ঘন্টা খানেক ঘুরিয়ে আনছে। আমরা আর নৌকা বিহারের উৎসাহ পেলাম না। সাড়ে চারটায় একটা দোকানের সামনে চা খেয়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করতেই চন্দ্রশেখর ফোন করে জানতে চাইলেন, আমরা কোথায় আছি। আমরা সমূদ্রের দিকে আছি জেনে এগিয়ে এলেন। আমি সেই ছোট রেস্টুরেন্টে রুটি বানিয়ে রাখতে বলেছিলাম; সেগুলি রাতের জন্য নিয়ে যেতে বেঁধে দিতে বললাম। আমার স্ত্রী আর কন্যা আটো নিয়ে হোটেলে চলে গেল, আমাদের ট্রলি ব্যাগ আনতে। পাঁচটার পর রওয়ানা দিলাম মন্ডপম স্টেশনের দিকে। মাঝে প্যামবান ব্রীজে ওঠার আগে একটু দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছবি তোলা হল। ঠিক সূর্য ডোবার আগে আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। টাকা দেওয়ার সময় চন্দ্রশেখর আস্তে অনুরোধ করায় আমরা পঞ্চাশ টাকা বেশী দিলাম। মণ্ডপম ষ্টেশন বেশ ছোট। বসার জায়গা বেশ কম। প্লাটফর্মে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আড়াই ঘন্টা কাটিয়ে দিলাম। রাতের ট্রেনে চেন্নাই এগমোর স্টেশনে ফিরে এলাম। সকাল সাতটার দিকে চেন্নাই পৌঁছে গেলাম। এগমোরে রেলের রিটায়ারিং রুম বুক করা ছিল; শুধু বুকিং এর কাগজটি দেখেই ঘরের চাবি দিয়ে দিল। আমি সাড়ে নটা নাগাদ বেরিয়ে একটা আটো নিয়ে মেরিনা বিচ ঘুরে এলাম। খুবই হতাশ হওয়ার মত জায়গা। প্রায় এক কিমি বালীর মাঠ পেরিয়ে সমূদ্র সৈকত। সকাল দশটার দিকে দুই একটা দোকান খুলছে দেখে ফিরে এলাম।

মেরিনা বীচ

স্টেশনের উল্টো দিকের একটা রেষ্টুরেন্টে খেয়ে একটা নাগাদ আমরা রওয়ানা দিলাম এয়ারপোর্টের দিকে। এগমোর স্টেশনের চার নম্বর প্লাটফর্মে রিটায়ারিং রুম, আর এগারো নম্বরের বাইরে মেট্রো স্টেশন। এগমোর মেট্রো স্টেশনে নীচে নামার জন্য শুধুই সিঁড়ি। বড় ট্রলি ব্যাগ নিয়ে নামাটা একটু কষ্টকর। এয়ারপোর্টে আমার স্ত্রী আর কন্যা ডিজি যাত্রা দিয়ে ভেতরে যেতে পারল; তারপরই আর কাজ করল না। আমার মত তিন চার জন বার বার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সেই " গো - মারুতি" ব্যবস্থায়, আধার কার্ড বেরকরে ভেতরে ঢুকলাম। এবারের মত সাত দিনের ভ্রমণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। এরপর দুটি ছোট ভ্রমণ, এই রাজ্যের মধ্যেই।.

ডুয়ার্স ভ্রমণ

এবার মার্চ মাসে কোথায় যাওয়া যায় ভাবার সময় একবার অযোধ্যা ফয়জাবাদের কথাও ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ডুয়ার্স এর জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হল। অনেক বছর আগে, প্রায় সাতাশ আঠাশ বছর আগে, একবার জলদাপাড়া জঙ্গলে বেড়াতে গেছলাম। তখন এসব অনলাইন এর ব্যাপার ছিল না। রায়গঞ্জ থেকে বাসে শিলিগুড়ি, সেখান থেকে একটা গাড়ী নিয়ে মাদারিহাটের জলদাপাড়া ট্যুরিষ্ট লজ। শীতকাল ছিল। তার উপর মেঘলা। রাত্রে জানলাম, সকালে হাতি সাফারী হবে। তখন এদিকে জীপ সাফারী ছিল না। বাজে আবহাওয়ার জন্য জঙ্গলে প্রায় কোন বন্য প্রাণী চোখে পড়েনি।

জলদাপাড়া, ১৯৯৮।

মাঝে একবার ঐ জলদাপাড়া জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পেরিয়ে গেছলাম, কোন এক আধিকারিকের বিশেষ অনুমতি নিয়ে। সেবারই দেখলাম, অনেক জীপ হয়েছে, সাফারির জন্য। প্রথমবারই শুনেছিলাম, জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার ভালো সময় মার্চ মাসে। সে সময় গাছে গাছে নতুন পাতা বেরোয়। তাই একবার মার্চে যাবো ভাবছিলাম। গোরুমারা আর চিলাপাতার খুব নাম শুনেছি, তাই এবার ঐ দুই জায়গায় যাওয়া ঠিক হল। এখন তো একেবারেই ষাট দিনের মাথায় ট্রেনের টিকিট কেটে নিচ্ছি। এ ছাড়া টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দোল পেরকরে যাওয়া ঠিক হল। পনেরই মার্চ শনিবার সন্ধ্যা আটটা পঁয়ত্রিশ এর কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে চললাম, নিউ মাল জংশন স্টেশন এর উদ্দেশ্যে। লাটাগুড়ি আর চিলাপাতার রিসোর্টে বুক করে দিয়েছে, আমার পুর্ব পরিচিত, গয়েরকাটার কৌশিক। পরে জানলাম , ওর একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে, নাম, আউট সাইড আউট ফিটার্স। কদিন আগে ওকে তিনটি জায়গায় যাওয়ার গাড়িও বুক করে দিতে বললাম। এখন এই রাজ্যের জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার কোন অনলাইন বুকিং হয় না। গোটা দেশের সব কিছু অনলাইনে হয়ে গেল, আর আমার রাজ্যের অনলাইন থেকে অফ লাইন হল। এতে কোন সুবিধাই হয়নি। উলটে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। আমি তো এক জায়গায় লাইন দিয়েও টিকিট পেলাম না। সে কথা পরে বলছি। ট্রেনে আমাদের সাথে গোটা দুই বড় দল চলেছিল।দুটি দলেই একটি করে খুব ছোট্ট শিশু। আমাদের পাশের বাচ্চাটি মাস ছয়ের হবে। রাত সাড়ে নটা দশটা পর্যন্ত দিদিমা ঠাকুমা ইত্যাদির কোলে বেশ খেলে বেড়াল। আমরা সবাই শোওয়ার ব্যবস্থা করার পরই

বাচ্চাটি কান্নাকাটি শুরু করলো। চলল প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত। সকালে উঠে দেখি ট্রেন তখনো ডালখোলা পৌঁছয়নি। এক ঘন্টা লেটে চলছে। কাজ আর কি; জানালার পাশে বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা। এবারই দেখলাম , ডালখোলা থেকে প্রায় বাগডোগরা পর্যন্ত মাঠ ভর্তি শুধুই ভুট্টার ক্ষেত। মাঝে মাঝে যে কয়েকটা আম গাছ আছে, সবই ফুলে ভরে গেছে। এবারই প্রথম কাঞ্চন কন্যা গাড়ীতে যাচ্ছি। আলুয়াবাড়ির পর নতুন রাস্তা। ঠাকুরগঞ্জ নামে একটা নতুন ষ্টেশন দেখলাম। নকশাল বাড়ী , বাগডোগরা হয়ে এই গাড়ী শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন এ পৌছল মিনিট পনের দেরি করে। এখানে মিনিট পনের দাঁড়ানোর কথা; প্রায় চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে তারপর ছাড়ল। শিলিগুড়ি জংশন ছাড়ার পর এই গাড়ী মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটা সুন্দর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে। আমি আগে একবার এই রাস্তায় ট্রেনে করে গিয়ে দেখেছি। জঙ্গল একেবারে ট্রেন লাইনের উপর এসে যায়। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুলে নিলাম। একটা সুন্দর ময়ূর দেখলাম, ছবি তোলা হল না।

নিউ মাল জংশনে ট্রেন পৌঁছল মিনিট কুড়ি দেরী করে। প্রায় ট্রেন খালি করে সবাই নেমে গেলাম। আমাদের গাড়ী বলা ছিল; চললাম লাটাগুড়ির দিকে। মাল বাজারের মধ্যে দিয়ে গাড়ী যাওয়ার সময় মনে পড়ল, বছর দশেক আগে একবার এখনকার হাসপতালে সাপের কামড় এর ট্রেনিং দিতে এসেছিলাম। এই দশ বছরে একেবারেই পাল্টে গেছে। কিছুই চেনা লাগল না। বাজার ছাড়িয়ে অনেকটা এগোনোর পর মনে পড়ল এখন মাল হাসপতালের সুপার ডা জানা আমার পরিচিত। ওদিকে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই ওকে আর জানালাম না। হাইওয়ে ধরে বেশ কয়েক কিমি এগোনোর পর এল চালসা। এখান থেকে ডান দিকে ঘুরে বড় রাস্তা ধরে সোজা চললাম। কয়েক কিমি এগোনোর পর রাস্তার পাশে চা বাগান শুরু হল। লাটাগুড়ি পৌঁছনোর দশ কিমি আগে থেকে শুরু হল গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা।

চালসা থেকে লাটাগুড়ি

এটাও ন্যাশনাল হাইওয়ে হলেও গাড়ী সেরকম চলে না দেখলাম। লাটাগুড়ি বাজারে পৌঁছনোর আগেই রেল লাইন এর উপরে ফ্লাই ওভার। আমাদের গাড়ী পাশের রাস্তা ধরে একশ মিটার মত এগিয়ে, পৌঁছে গেল আমাদের রিসর্টে। রিসর্টে চা খেয়ে আমি হেঁটে ঘুরে এলাম, জঙ্গল সাফারী করার টিকিটের অফিস। একজন কর্মচারী জানাল, দুটো থেকে টিকিট দেওয়া হবে, এসে লাইন দেবেন। আমরা হোটেলে খেয়ে আবার হেঁটে গেলাম সেই টিকিটের আপিসে। এবার দেখি বেশ লোকজনের ভিড়। জন দশেকের পিছনে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে নিলাম। এটা ওয়াচ টাওয়ার সাফারির আপিস। টিকিট নিয়ে পাশের ঘরে থাকা গাইডের কাছে গেলাম। তাকে টিকিট আর গাড়ী ভাড়ার টাকা দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ঠিক পৌনে চারটায় আমাদের রিসর্ট থেকে তুলে নেবে, তারজন্য একশ টাকা অতিরিক্ত দিলাম। টিকিটের দাম তিনজনের দুইশ সত্তর টাকা। গাড়ী আর গাইড মিলে ষোলোশ আশি টাকা। চারটার আগে গাড়ী এসে গেল। চললাম গোরুমারার যাত্রা প্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার সাফারী করতে।

লাটাগুড়ি থেকে চালসার দিকে প্রায় দশ কিমি হাই ওয়ে ধরে এগিয়ে, যেখানে জঙ্গল শেষ হয়ে চা বাগান শুরু হয়েছে, গরুমারা জাতীয় অরণ্যের গেট সেখানে।

দুই পাশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ী হু হুঁ করে মিনিট পনের সময়ে গেটে পোঁছে গেল। অমাদের সামনে আর একটা মাত্র গাড়ী। নেমে , গেটের আপিসে খাতায় নাম ধাম লিখতে হল। এর মধ্যে এক এক করে পনের কুড়িটা গাড়ী এসে গেল। ঠিক সাড়ে চারটায় গেট খুলল। সাদা মাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম জঙ্গলের ভেতর। আধ কিমি এগিয়েই বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। সামনের গাড়ী যে ধুলো উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে তার থেকে বাঁচতে একটু দুরত্ব রেখে চলতে হচ্ছে। জঙ্গল বেশ ঘন, বেশ উঁচু উঁচু গাছ। কিন্তু পাখির ডাক প্রায় নেই। গোটা তিনেক ময়ূর রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের ছবি তোলার জন্য যেন একটু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই বনে কোন বানর বা হরিণ দেখা গেল না। প্রায় পাঁচ কিমি চলার পর , বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় গোটা কয়েক কাঠের বাংলো বাড়ী। ওখানেই চার পাঁচটি পোষা হাতি বেঁধে রাখা আছে। আমরা না থেমে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও তিন কিমি মত এড়িয়ে গাড়ী থামল, বিরাট বিরাট শাল গাছের ছায়ায়। সবাই নেমে চললাম, যাত্রা প্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার এর দিকে। অন্য টাওয়ার এর মত এখানে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার দরকার হয় না। ছোট ছোট তিনটি টিনের চালের আটচালা করা আছে। তার সামনে কয়েক সিঁড়ি নেমে, ছাদে দাঁড়িয়ে নীচে দেখার মত, পঞ্চাশ ফুট মত নিচে মূর্তি নদী।

সামনে অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠের মত ঘাসের জমি। প্রায় পাঁচশ মিটার মত দূরে নদীর অন্য পারে কয়েকটা মোষ দেখা গেল। প্রায় ঐ রকম দূরে, নদীর উপর ঝুলে থাকা একটা শুকনো ডালে দুটি বড় পাখি বসে আছে মনে হল। এত দূর থেকে কি পাখি বোঝা সম্ভবত নয়; গাইড বলল, হর্নবিল। আলো ক্রমশ কমে আসছিল। গাইড, বেশ দূরে নদীর চড়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, ঐখানে একটা গণ্ডার আছে। খালি চোখে বোঝা যাচ্ছিল না। বাইনোকুলার দিয়ে দেখে বোঝা গেল। আরও মিনিট দশেক পর দূরে দুটি বাইসন বা গাউর দেখা গেল। এরপর একটু ফাঁকা মাঠের উপর দুটি গণ্ডার আস্তে আস্তে হেঁটে গেল দেখলাম। নদীর জলের ধারে এক জায়গায় কয়েকটা কচ্ছপ বসে আছে বলল বটে, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। গণ্ডার দেখে লোকজন এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে আর কোন প্রাণী এদিকে আসবে না, বোঝাই যাচ্ছিল। এবার সবাই এসে গাড়ীতে উঠে বসার পর, এক এক করে গাড়ী ফেরার রাস্তা ধরল। ফেরার সময় সেই পোষা হাতিগুলির কাছে এসে সবকটি গাড়ী থামল। একশ মিটার মত হেঁটে, রাইনো ভিউ পয়েন্টে গিয়ে দাড়ালাম। সামনে নিচে সেই একই রকম নদীর চরের দৃশ্য। এখানে কোন প্রাণী দেখা গেল না। সব গাড়ী ফেরার রাস্তা ধরল। গেটে পৌঁছে আপিসের খাতায় সই করে সময় লেখার

সময় দেখলাম, ঘড়িতে ছয়টা বাজে। রিসোর্টে পৌঁছে গেলাম মিনিট পনেরোর মধ্যে। গাইড বলেছিল, টিকিট কাটার আপিসের কাছে ট্রাইবাল নাচ দেখতে পারেন। আমরা আর উৎসাহ পেলাম না। আজকের এই সাফারির নাম ছিল, ওয়াচ টাওয়ার সাফারী। অন্য একটা আপিস থেকে সকাল ছয়টায় জঙ্গল সাফারী করার টিকিট দেয়। গাইড বলেছিল, মিনিট দশেক আগে গিয়ে লাইন দিলেই টিকিট পেয়ে যাবেন। রিসোর্টে পৌঁছে ম্যানেজারকে বোললে সে বলল, ভোরে লাটাগুড়ি বাজারে পৌঁছনোর জন্য টোটো বলে দিচ্ছি। কিন্তু টিকিট পাবেন কি না বলা মুশকিল, লোকে রাত থেকে লাইন দেয়। আমরা ভোরে উঠে তৈরী হয়ে গেলেও রিসর্টের গেট খুলে বেরোতে মিনিট দশেক দেরী হয়ে গেল। পৌঁনে ছটায় লাইন দিয়ে টিকিট পেলাম না। পরে দেখলাম, টিকিট না পেয়ে ভালোই হয়েছে। আমাদের টোটো চালক বেশ অভিজ্ঞ লোক। সে বুঝতেই পেরেছিল, এরা টিকিট পাবে না, তাই অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের একটা সুন্দর সকাল উপহার দিল।

গোরুমারা জঙ্গল সাফারী না হলে লাটাগুড়ির আশপাশটা একটু ঘুরে রিসর্টে ফিরে যাব, এরকম ভেবেই বেরিয়েছিলাম। এই যে অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থাটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা কার বুদ্ধিতে, কি কারণে হয়েছে জানিনা। এটা যে খুবই বাজে একটা কাজ হয়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। লোকে ভোরে উঠে গিয়ে লাইন দিয়ে, শেষ পর্যন্ত জানবে, টিকিট নেই। এতে দালালি ব্যপারটা উৎসাহ পাবে। যাই হোক, আমরা টোটো চালক এর সাথে পাঁচশ টাকা দিয়ে ঘোরার চুক্তি করে নিলাম। উত্তরবঙ্গে সকাল একটু দেরী করেই শুরু হয়। ফরেস্ট অফিসের কাছে কোন চায়ের দোকান খোলা নেই। প্রায় দেড়শ গজ এগিয়ে একটা চায়ের দোকান দেখে দাঁড়ানো হল। এখানে কিন্তু সকালে বেশ ঠাণ্ডা। আমরা সোয়েটার টুপী নিয়েই বেড়িয়েছি। টোটো চলার সময় যেরকম ঠাণ্ডা লাগছিল, এই বছর গোটা শীতকালে দমদমে সেরকম ঠাণ্ডা পাইনি। চা খাওয়ার পর চললাম বড় রাস্তা ছেড়ে উল্টো দিকে। প্রথমে একটু পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। দূরে দূরে মাঠের ভেতর সব রিসর্ট। লাটাগুড়িতেই বোধহয় একশ কি তার বেশী রিসর্ট দেখলাম। একটি বাগান ঘেরা রিসর্ট দেখিয়ে টোটো চালক দাদা জানালেন, ওটা সারদা চিট ফান্ডের মালিকের ছিল; বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা নেওড়া নদীর ব্রীজ পেরিয়ে গেলাম। দুই চারটা গ্রামের বাড়ি পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম নেওড়া নদী চা বাগানে। এটা টাটা কোম্পানির একটা চা বাগান। ডুয়ার্সের প্রায় সব রাস্তার পাশে পাশে শুধুই চা বাগান দেখা যায়। টাটাদের এই বাগানটা যেন সবথেকে সুন্দর। শীতের সকালে উজ্জ্বল সবুজ চা পাতার উপর শিশির পড়ে আছে। তার উপর সকালের রোদের সোনালী রঙের জন্য খুব সুন্দর একটা শোভা যেন। তার থেকেও বেশি আকর্ষণীয় হল , অনেক ময়ূর। চোখে দেখার আগেই ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। বাগানের কারখানা, হাস্পাতাল, স্কুল ছাড়িয়ে বাম হাতে ম্যানেজারের বাংলো। এত বেশী গাছপালা দিয়ে ঘেরা যে রাস্তা থেকে দেখাই যায় না। চোখে পড়ার মত উজ্জ্বল লাল রঙের বোগেনেভ্যায়ালিয়া লতার , প্রায় তিন তলা সমান উঁচু ঝোপ গেট তৈরী করে রেখেছে। এসব ছাড়িয়ে কয়েক মিটার এগোলেই রাস্তার দুই পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চা বাগান। আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। আরও দুই তিন শ মিটার এগিয়ে, রাস্তার পাশে টোটো রেখে আমরা বাগানের ভেতর চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তা ধরে বাগানে ঢুকলাম। এবার গাছের ডালে, দূরে ঘাস জমিতে অনেক ময়ূর দেখলাম।

এক এক জায়গায় গাছের উপর তিনটি করে ময়ূরও দেখলাম। দুটি বড় ধনেশ পাখিও দেখা গেল। বাগান ছড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে ফাঁকা মাঠের আল ধরে চলল টোটো। এদিকেও অনেক ময়ূর। বাঁ দিকে রেল লাইন রেখে প্রায় পাঁচশ মিটার মত এগিয়ে নেওড়া নদী পেলাম। ওখান থেকে ফেরার রাস্তা ধরলাম। চা বাগানের ভেতর যে বড় গাছগুলি থাকে তাদের অনেককটাতেই গোল মরিচের লতা উঠেছে। টোটো চালক দাদা জানালেন ওনারও গোল মরিচের চাষ আছে। পরে ওনার থেকে কিছু গোল মরিচ আমরা কিনে এনেছি।

গোল মরিচ লতা

আটটার মধ্যে রিসর্টে ফিরে এলাম। আমাদের আজ চিলাপাতা চলে যাওয়ার কথা। দশটায় গাড়ী আসতে বলেছিলাম, সাড়ে নটার আগেই এসে গেল । আমরাও তৈরী হয়ে ছিলাম, রওনা হলাম নব্বই কিমি দূরে চিলাপাতার উদ্দেশ্যে। আগেই বলেছি, আমাদের লাটাগুড়িতে থাকার রিসর্ট চালসার দিকে এক কিমি মত এগিয়ে। এর নাম ক্যাম্পিং ডে ডুয়ার্স। বেশ সাজানো গোছানো রিসর্ট। তিন দিকেই বড় বড় শাল গাছের বন। সারাদিন প্রচুর পাখির ডাক শোনা যায়। আমাদের বাড়ীর মত রান্না, তেল মশলা খুব কম দিয়ে রান্না করে, তাই আমাদের বেশ ভালো লেগেছে।

লাটাগুড়ি থেকে চালসা এসে ডান দিকে চলল আমাদের গাড়ী। এটাও বেশ চওড়া ন্যাশনাল হাইওয়ে। মাঝে মাঝেই রাস্তার পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ চা বাগান। এথেলবাড়ি মোড়ে পৌঁছে একটা দোকানে ঢুকে চা খেলাম। তারপর নতুন ন্যাশনাল হাইওয়েতে পরে বাম দিকে চললাম। এই রাস্তায় দুটি বড় মিলিটারী বেস ক্যাম্প আছে; বিন্নাগুড়ি আর হাসিমারা। হাসিমারায় ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে ডান দিকে ছোট রাস্তায় চলল গাড়ী। এই রাস্তা প্রায় গোটাটাই জলদাপাড়া জাতীয় অরণ্যের ভেতর দিয়ে। চিলাপাতায় আমাদের রিসর্ট বাজার ছড়িয়ে আরও প্রায় দুই কিমি দূরে , কালজানী নদীর পশ্চিম পাড়ে। ওদিকে ধুধু প্রান্তরের মাঝে এরকম পাঁচ সাতটা রিসর্ট আছে। সন্ধ্যার পর দূরে দূরে রিসর্টে আলো জ্বলে উঠল, তখন বোঝা গেল, ওদিকে অনেক রিসর্ট আছে। ডুয়ার্সের প্রায় সব নদীর মত এই কালজানি নদীও বেশ চওড়া। কাছে না গেলে জল দেখা যায় না। ভোর চারটে থেকে নদীর গর্ভ থেকে বালি তোলার ট্রাক আর ট্র্যাক্টর এর শব্দ শোনা যায়। আমি বিকেল একা একা নদীর পাড়ে ঘুরতে গেলাম। ধুধু প্রান্তরের মাঝে কিছু গরু বাছুর চড়ে বেড়াচ্ছে।

সন্ধ্যার পর আর কিছু করার নেই। ওখানে ইন্টারনেট সংযোগ খুব দূর্বল। মোবাইলেও কিছু দেখা যায় না। রিসর্টের ঘরে টিভিও ছিল না। তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে সাতটায় সাফারির জীপ আসার কথা, এল না। আমরা তৈরী হয়ে বসে বসে খুবই হতাশ হলাম। দুপুর বারোটার সাফারী হতে পারে জানাল। ঐ দুপুরে জঙ্গলে গিয়ে কোন প্রানী দেখার কথা নয়। আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে , দুপুর দু' টায় সাফারী শুরু হল। বাজারের ভেতরের ফরেষ্ট আপিস থেকে পারমিট নেওয়ার জন্য এক ঘন্টা গাড়ীতে বসে বসে হতাশার চুড়ান্ত হল। জঙ্গল কিন্তু আমাদের হতাশ করেনি। জঙ্গলে ঢোকার মিনিট পাঁচ সাত পরই একটি গণ্ডারের দেখা পেলাম। আমাদের গাড়ীর দশ মিটার সামনে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গেল। সদ্য স্নান করে উঠেছে; গায়ের রঙ কালো, চকচক করছিল। রাস্তার থেকে কুড়ি ফুট মত দূরে ঝোপ জঙ্গলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেক সময়। আমরা ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। এই জঙ্গলের অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে পাকা রাস্তা ধরে হাসিমারার দিকে চার পাঁচ কিমি এগিয়ে গেলাম। এরপর বাম দিকে জঙ্গলের ভেতর চলল গাড়ি। মিনিট দশেক পর বাম দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি মাঝারি মাপের হাতি দেখে দাড়ালাম। কয়েকটা ছবি তুলে এগিয়ে চললাম ঘাসের জলা জমির দিকে। এই ঘাসের মাঠের উল্টো দিকে, প্রায় দেড় কিমি দূরে দুটি হাতি দেখা গেল। বাঁ দিকে জঙ্গল আর ডান দিকে জলা রেখে প্রায় এক কিমি এগিয়ে একটি ওয়াচ টাওয়ার পেলাম। একজন বন বিভাগের কর্মি টাওয়ার এ বসে ছিলেন; দূরে মাঠের দিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ জায়গায় সম্বর হরিণের দল আছে। আমরা কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে কিছুই দেখতে পেলাম না। নেমে এলাম। ফেরার সময় এক জায়গায়, গাইড গাড়ী থামাতে বলল। কুড়ি মিটার মত দূরে, বাম দিকে রাস্তার পাশের বড় বড় গাছের নিচে একদল হাতি দেখতে পেলাম। দলে একটি বড় দাঁতাল হাতি আছে দেখে , একটু একটু করে গাড়ি পঞ্চাশ মিটার পিছিয়ে নেওয়া হল। স্টার্ট বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। একটি ছোট হাতি হেঁটে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল। তার পিছন পিছন বড় দাঁতাল হাতিটি পেরিয়েই ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকল। বাঁ দিকে আরও গোটা তিনেক বড় হাতি গাছের নিচে দাঁড়িয়েই থাকল। আমরা প্রায় মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে থেকে এগোনোর কথা ভাবলাম। এক সময় বেশ চাপে পড়ে গেছলাম। হাতি তো এক দেড়

ঘন্টা রাস্তায় বসে থাকতে পারত। আমাদের দুপুরের খাওয়া হয়নি। তারপর আবার পাঁচটা চল্লিশের ট্রেন ধরতে তিরিশ কিমি দূরে নিউ আলিপুর দুয়ার জংশন স্টেশন যেতে হবে। ঐ রকম দাঁড়িয়ে থাকায় সময়, গাড়ী থেকে প্রায় একশ মিটার পিছনে, একটু সম্বর হরিণের রাস্তা পেরোনোর ছবি মোবাইলে রেকর্ড করা গেল। জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে বন্য প্রাণী দেখতে না পেলে হতাশ হয়ে যাই। কিন্তু বন্য প্রাণী তাড়া করলে কী বিপদ হতে পারে, আমরা ভাবি না।

আবার সেই পাকা রাস্তায় ফিরে এক কিমি মত চলে , গাড়ী বাম দিকে জঙ্গলের রাস্তা ধরল। তখন তিনটা পেরিয়ে গেছে। গাইডকে বললাম, আমরা চারটার আগে রিসর্টে ফিরতে চাই। এই রাস্তায় বেশ কিছু ময়ূর দেখলাম। গাড়ী আর পাকা রাস্তায় না ফিরে অন্য দিক দিয়ে গ্রামের রাস্তায় বেরোল। তিনটে চল্লিশ নাগাদ রিসর্টে ফিরে মাছ ভাত খেয়েই ট্রেন ধরার জন্য রওনা দিলাম। গাড়ী তিন কিমি মত গ্রামের রাস্তায় চলে একটি ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরল। এই রাস্তা আসামে চলেছে; তাই রাস্তায় বড় বড় ট্রাক চলেছে, অনেক। একটি নদীর ব্রীজ পেরিয়ে দেখলাম, বেশ কিছু গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের গাড়িও দাঁড়াল। নিচে জঙ্গলের ভেতর একটি হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকেই ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত। আমরা পাঁচটার আগেই স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। গাড়ী দাঁড়িয়েই ছিল। ঠিক সময়ে পদাতিক এক্সপ্রেস চলতে শুরু করতেই মনে হল, এবারের মত ডুয়ার্স ভ্রমণ শেষ হল। অনেকেই খরচ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চেয়েছেন।

আমরা যে সব রিসোর্টে থেকেছি সাধারণ ভাবে ওদের একদিনের ভাড়া, দুই জনের জন্য আড়াই হাজার টাকা মত। সাফারির খরচ গোরুমারায় দুই হাজার টাকা মত, ছয় জনের। দুই জন হলেও একই খরচ। চিলাপাতায় আমাদের খরচ হয়েছে ২৬৫০ টাকা। রিসর্টের দূরত্ব অনুযায়ী এক থেকে চারশ টাকা বেশী চাইবে। আমাদের ষ্টেশন থেকে আনা, পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেড় হাজার টাকা করে গাড়ী ভাড়া লেগেছে। লাটাগুড়ি থেকে চিলাপাতা গাড়ী ভাড়া লেগেছে সাড়ে তিন হাজার টাকা। ট্রেন ভাড়া AC Three tyer আমাদের দুই জনের

যাতায়াতে সাড়ে চার হাজার টাকা মত লেগেছে। ডুয়ার্সের মোটামুটি তিনটি জঙ্গলে লোকে যায়। আমরা জলদাপাড়া আগে ঘুরেছি তাই এবার ওটার কথা ভাবিনি। শিয়ালদা থেকে নিউ মাল জংশন যাওয়ার সরাসরি একটিই ট্রেন, কাঞ্চন কন্যা। নিউ জলপাইগুড়ি গিয়ে অটো নিয়ে শিলিগুড়ি জংশন চলে যেতে পারেন। ওখান থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আছে। লাটাগুড়ি থেকে চিলাপাতা নব্বই কিমি মত। জলদাপাড়া ঠিক মাঝখানে পড়বে। আমি মধ্যপ্রদেশ আর উত্তরাখণ্ডের ন্যাশনাল পার্কে ঘুরেছি। ওদিকে হরিণ আর বাঁদর অনেক বেশি। কিন্তু জঙ্গল আমাদের ডুয়ার্স এর মত ঘণ নয়। কাজিরাঙ্গায় গণ্ডার অনেক দেখতে পাবেন, কিন্তু জঙ্গল প্রায় নেই, সবই বড় বড় ঘাসের জলা। সুন্দরবন তো নদীর উপর নৌকায় বসেই দেখতে হয়। ২০.৩.২৫.